আজ শুরুতেই আমরা আলোর কথা বলব—পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দৌড়বীর আলো। যার গতিবেগ শূন্য মাধ্যমে সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বা ৩০০,০০০ কিলোমিটার। এই প্রচণ্ড বেগ সম্বন্ধে ধারণা করাই মুস্কিল। কারণ আমাদের রোজকার চলাফেরা, কাজকর্মের গতিবেগের তুলনায় আলোর এই মারাত্মক বেগ কতকটা ভীষণ জোরে ছুটে চলা ইলেকট্রিক ট্রেনের পাশে শামুকের গতির চেয়েও অনেক অনেক গুণ কম। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি। যত বস্তুর বেগ নিয়ে আমরা হিসেব করি তার ভেতরে সূর্যের চারপাশে ঘুরে চলা পৃথিবীর বেগই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেই বেগও সেকেণ্ডে মাত্র ৩০ কিলোমিটার, যা আলোর কাছে নিতান্ত শিশু বললেও বেশি বলা হয়।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, আলোর এই ভেলোসিটি প্রায় ধ্রুব। তা কোনো উপায়ে কমেও না, আবার বাড়েও না। তবে একথা ঠিক যে একেক মাধ্যম দিয়ে আলো একেক রকম গতিবেগে দৌড়য়। যেমন একটা সাইকেল বালির ওপর দিয়ে এক রকম, ঝোপ-ঝাড় কিংবা রোদ-গলা পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে আর এক রকম এবং সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে আর এক রকম গতিবেগে দৌড়বে।

যদি আলোর চলার পথের মাঝখানে একটা কাচের পাত রেখে দেওয়া যায়, তবে কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় তার গতিবেগ কিছুটা কমে যাবে ঠিকই, কিন্তু কাচ ছাড়িয়ে বাইরে, অর্থাৎ বায়ু-মাধ্যমে এলেই আলোর গতিবেগ হবে আবার সেই ১৮৬,০০০ মাইল বা ৩০০,০০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

স্পোর্টসম্যান আলো

কাঁদ আর মাথা কোট কর যত বায়না
এনারজিদের তবু চোখে দেখা যায় না।
বৈজ্ঞানিকেরা বলে দেশি ও বিদেশি
লাইটের ভেলোসিটি সবচেয়ে বেশি।
আন্ত-এনারজিক কোনো এক স্পোর্টসে
টেংরিতে খেয়েছিল ভয়ানক চোট সে;
তাই নিয়ে দৌড়িয়ে দেখিয়েছে ভেল্কি,
এমনিতে মজাদার আলোকের খেল কি।
সব শেষে এই কথা জেনে রাখা ভালো
বিদঘুটে পালোয়ান মিস্টার আলো,
দুই ঠ্যাঙে যদি তার দড়ি বেঁধে দাও
ভেলোসিটি একটুও কমবে না তাও!

যতদূর মনে পড়ে তখন আমরা ক্লাস এইটের ছাত্র। শিবপুর বি. ই. কলেজে মানিক স্যারের কোয়ার্টার আমাদের গবেষণাগার। আমরা তিনটে খুদে প্রাণী তিন মস্ত বড়ো বিজ্ঞানী— পার্থ, অমিত আর আমি। স্যার আমাদের নেতা।

ভাসা ভাসা মনে পড়ছে সেই ঘরেই আমরা কাগজের ঠোঙায় জল ফোটানোর এক্সপেরিমেন্ট করেছিলুম। স্যার বোধহয় এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে কাগজ যত উত্তাপে পুড়তে শুরু করে, তার চেয়ে কিছুটা কম উত্তাপে জল শুরু করে ফুটতে। তাই এটা সম্ভব। আবছা স্মৃতির ঐ ব্যাখা কতটা সত্যি তা যাচাই করে দেখিনি কখনো। কেউ তেমন আগ্রহী হলে কোনো পদার্থবিদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

কিন্তু ছড়াটি লিখে ছাপবার আগে একটা পরীক্ষা করে দেখেছি যে কাগজের ঠোঙায় ডিম সেদ্ধ করা খুব সহজেই সম্ভব। সেদ্ধ না বলে ছড়ায় হাফ বয়েল বলেছি তার কারণ আছে। আমার সে পরীক্ষায় ডিম সম্পূর্ণ সেদ্ধ হবার আগেই পাতলা কাগজের ঠোঙা ফেটে গিয়েছিল।

এ পরীক্ষা করতে গেলে আগুনের শিখার ওপর সরাসরি কাগজের ঠোঙাটিকে না আনাই ভালো। এতে ঠোঙার যে অংশ শুকনো সেখানে আগুন লেগে অসুবিধে হতে পারে।

আমি তো বুনসেন বার্নারের অভাবে রান্নার গ্যাসের ওপর চাটু বসিয়ে সেই তেতে ওঠা চাটুতে বসিয়েছিলাম কাগজের ঠোঙা, ডিম আর জল। ঠোঙাটিকে তৈরি করেছিলাম সম্পূর্ণ অরিগামি পদ্ধতিতে।

এবার জানাই—আমার এক্সপেরিমেন্ট-জাত সেই হাফ বয়েল ডিমটিকে খেয়েছিলেন স্বয়ং আমার মা। এবং বেশ খুশিমনেই।

মজার খেলা

ডিমের হাফ বয়েল
খাবে যদি বলো
হাঁড়ি, ঘটি, বাটি ফেলে
চট্‌পট্ চলো--
কাগজের ঠোঙা এক
নিয়ে এসো ছুটে,
প্রয়োজন নেই কাঠ,
কয়লা বা ঘুঁটে।
বুনসেন বার্নারে
দাও না চাপিয়ে,
কাগজের ঠোঙা জল
ডিমটাকে নিয়ে।
আজব কাণ্ড, ডিম
সেদ্ধ হবে!
এখুনি করো না, আর
করবে কবে?

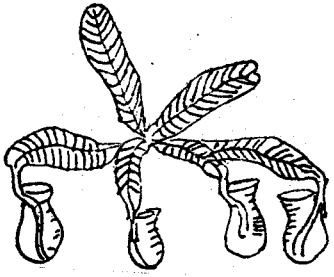

রাক্ষুসে গাছ

নানান ধরন উদ্ভিদ তার
নানান ধরন ধাঁচ,
ইনসেক্‌টিভোরাস মানেই
পতঙ্গভুক গাছ।
তারা পরভোজী গাছ সবাই,
করে প্রোটিন খাবার হ্যাংলামিতে
পতঙ্গদের জবাই।
তারা কেউ জলে কেউ ডাঙায়
তারা পতঙ্গদের বন্দী ক'রে
চোখ বুঁজে মুখ ভ্যাঙায়।
নেপেনথিসের ডাঙায় বাড়ি,
অ্যালড্রোভেণ্ডা জলে,
ড্রসেরা গাছ জাপটে ধরে
আজব শুঁড়ের কলে।

তারা আজগুবি এক প্রাণী।
শোনো, পতঙ্গদের রানী—
তারা কেউ বা শুঁড়ের
কেউ কলসের
ফাঁদ পেতেছে জানি।
তারা আজগুবি এক প্রাণী!

তাদের নানান ফিকির ফন্দি,
এক নিমেষে 'ট্র্যাপ-ডোরে' কেউ
করবে তোমায় বন্দী.
নানান ফিকির ফন্দি।
তোমায় হজমি রসে হজম ক'রে
জুড়বে খুশির নাচ,
জলে-ডাঙায় ওত পেতেছে
রাক্ষুসে সব গাছ।

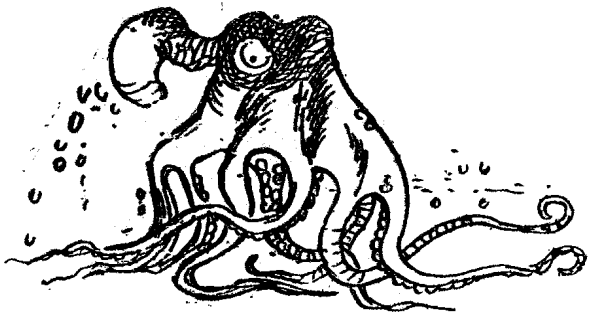

অক্টোপাস হিউমেলিঙ্কি

আটটা শুঁড়ে ঠাট্টা করে
অক্টোপাসের ছা,
খায় দায় ঘুম যায়
তাইরে নাইরে না।

নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং
মাথার থেকে বার হয়েছে—
অক্টোপাসের ঠ্যাং!

নুন সাগরের গভীর জলে
অক্টোপাসের ছানা—
একলাটি এক আজব দানো
গেড়েছে আস্তানা।

বিটকেলে শুঁড় শিকার ধরে
মাংস খেকো প্রাণী,
বিপদ এলেই রং ছিটিয়ে
বিদঘুটে শয়তানী!

জলের তলায় অক্টোমামার
অষ্টো রকম ঢং,
ভয় ধরলেই রং পাল্টান,
রাগ ধরলেও সং।

জলের ভেতর ডিম পাড়ছেন,
জলের বুকেই তা—
হাড় নেই, তাও হাড়-বজ্জাত
অক্টোপাসের মা ॥

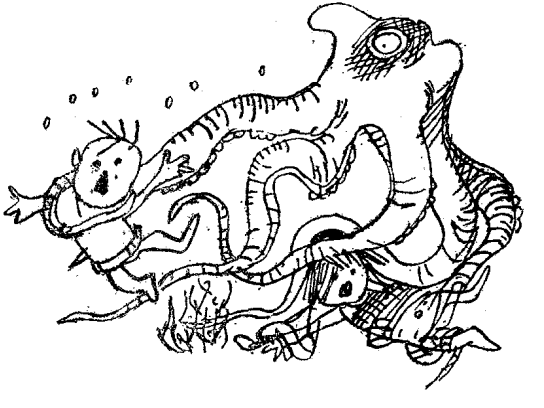

ছড়াটাকে শুধু ছড়ার ছড়া বলে ভাবলে ভুল হবে। তবে একথাও ঠিক যে এটা কিন্তু আসলে ছড়াই। তা না হলে অ্যামোনিয়ারই বা হঠাৎ বোম্বে যাবার শখ হবে কেন, আর বাতাসের ছোড়দির-ই বা এতো সর্দির ভয় কিসের ?

বাতাসের কাঁধে চেপে অ্যামোনিয়ার বোম্বে যাবার প্রসংগকে পরিষ্কার করে বোঝানোর কোনো দরকার নেই। কারণ আমরা সকলেই জানি যে বর্ণহীন ঝাঁঝাল গ্যাস NH_3 বাতাসের চেয়ে হালকা।

কিন্তু সর্দি প্রসঙ্গ যখন এলোই তখন একটু কপচে নেওয়া যাক। আমাদের চোখের ঠিক ওপরের ল্যাকরিমাল গ্রন্থি উত্তেজিত হলে সেখান থেকে জল গড়িয়ে নামে চোখে, সেখান থেকে নাকে। এরকম অবস্থায় দেখা যায় নাকের ভেতরের মিউকাস মেমব্রেন বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফলে চোখের জলে নাকের জলে একাকার। আর এই চোখে জল ঝরানোর ব্যাপারে ঝাঁঝাল গ্যাস অ্যামোনিয়ার বিশেষ কেরামতি।

ইস্কুলে আমাদের অ্যামোনিয়া (NH_3) পড়াতেন কেমিস্ট্রির শিক্ষক রবীন স্যার। এখনও কানে বাজছে তাঁর সেই সমস্ত কথা। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগগুলির মধ্যে অ্যামোনিয়াই প্রধান। তা জলে খুব দ্রবণীয়, ও বিশেষ অবস্থায় এতোই ঠাণ্ডা যে শীতক হিসেবে অ্যামোনিয়াকে জল জমিয়ে বরফ তৈরির কাজে লাগান হয়।

কাজেই মিস্টার অ্যামোনিয়া বস্তুটি নামে দামে কামে কম বিখ্যাত নন। অনেক বড় বড় শিল্পের প্রধান এবং মূল উপাদান এই যৌগ। নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), কৃত্রিম সার, প্লাস্টিক প্রভৃতি তৈরি করতে অ্যামোনিয়ার রোল বাংলায় যাকে বলে এসেনসিয়াল।

অ্যামোনিয়া

অ্যামোনিয়া বলে, "আমি কাল যাব বোম্বে
যাত্রার খাটুনিটা কোন পথে কোমবে ?"
বাতাসের কাঁধে চড়ে
এক্ষুনি পড় সরে
তাহলেই জার্ণিটা ভালো মতো জোমবে।"

"অ্যামোকে দেখেই আমি তাড়াতাড়ি দোর দি,"
ফিস্‌ফিস্ করে বলে বাতাসের ছোড়দি ;
"ও বাতাস ভাইরে
গিয়ে কাজ নাইরে
অ্যামোনিয়া কাঁধে নিলে ধরে যাবে সর্দি।"

লেখাটি পড়ে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি বিজ্ঞান পুস্তকের জাত সম্পর্কে যে সন্দিহান হয়ে উঠবেন তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা পণ্ডিত নই প্রাকৃত। জাতের শুচিতা মানি না। তাই খুব সহজেই দেখাব এমনকি বিজ্ঞানের জগতে ঢুকতে গেলেও খেয়াল রসের পাসপোর্ট বা ভিসার দরকার হয় না। অন্তত বিজ্ঞানের ছড়ার জগতে তো বটেই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো খেয়াল রস ব্যাপারটা কি? ঠিক মনে পড়ছেনা, সেক্সপীয়ার অনেকটা এই ধরণের কথা বলেছিলেন, "গোলাপকে যে নামেই ডাকিনা কেন তা গোলাপই থাকবে।" তেমনি আবোল তাবোল, Nonsense Rhyme, Amphigory ইত্যাদি খেয়াল রসেরই বিভিন্ন নাম। খেয়াল রস আসলে খেয়াল রসই।

কেউ কেউ খেয়াল রসের কাব্যকে খেলো করতে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন, "এক ধরণের মজার অথচ মানে বোঝানোর চেষ্টা নেই—এমন হাল্কা কবিতাকে Nonsense Verse বলা হয়।" এক্ষেত্রে গোড়ায় গলদ ঘটে গেছে। চানাচুর রসগোল্লা নয়। চানাচুরের সৌন্দর্য সম্মান ও সার্থকতা তার চানাচুরত্বেই।

আসলে খেয়াল রসের শেকড় আরো গভীরে এক জটিল রহস্যময়তায়। "ননসেন্স প্রণেতা চালিত হন তাঁর খেয়ালী মেজাজের দ্বারা—ধীশক্তির দ্বারা নয়। তাঁর সৃষ্ট জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বিপর্যস্ত। এখানে ফুল ফোটে 'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম' শব্দ তুলে, 'শাঁই শাঁই পন্ পন্ করে' ফুলের গন্ধ ছুটে যায়...,ননসেন্স রচয়িতা তাঁর নিজস্ব জীবনবেদ অনুসারে একটি স্বতন্ত্র, অর্থহীন (nonsensical) জগৎ নির্মাণ করেন - যা গভীরতর অর্থে ট্র্যাজিক, রোমান্টিক কিংবা আধ্যাত্মিক জগতের সংগে তুলনীয়।" (কবিতার কথা ; বিমলকৃষ্ণ ঘোষ)

জীবন

জীবনটা যেন এক ডেলটা,
দুই চাকাওলা এই মেলটা
বহুদিন বহুকাল চলবে,
মেল্‌টিং পয়েন্টে গলবে।
ভেলোসিটি কতো তার জানি না,
মোমেন্টামকে আমি মানি না।
হৃদয়টা অংকের থিয়োরি
দিয়ে জানি মিলবে না সিওর-ই।
ভেঙে যায় ইলেক্‌ট্রোলিসিসে—
ফ্রয়েড সাইকো-এনালিসিসে।
ছড়া-টড়া নয় আর কাব্য,
এবার অন্য কথা ভাবব ॥

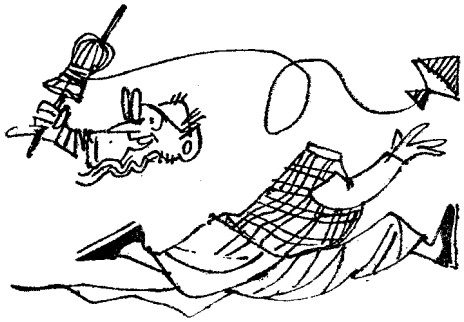

টাক থেরাপি

বলতে পার, টাক পড়েছে কারণটা তার কি,
ডায়োগনিসিস করলে দেব হাজার টাকা ফি।
কেউ বলে টাক বংশগত, কেউ বা বলে মনের
অশান্তিতে টাক পড়েছে মেজাজী বাপধনের ;
কেউ বা বলে পেটের রোগে, কেউ বা কালাজ্বরে,
আঁতেল লোকের আ-তেল মাথায় জমকালো টাক পড়ে।
কেউ বা বলে চুল উঠেছে, টাক পড়েছে তাই ;
চুলের পেটে বেজায় ক্ষিদে তাই করে খাই খাই !
চুল বলে রোজ খাব খাব—ভাইটামিনের অভাব,
রুটিন মাফিক প্রোটিন খাওয়া জন্মগত স্বভাব ;
চুলের পেটে জ্যান্ত ছুঁচোর কাঁচুর মাচুর ডাক ;
আসল কারণ কেউ জানে না, তাই পড়েছে টাক !
তেল চক্‌চক্ টাকের কারণ জানতে কি কেউ চায় ?
টাকের রোগে টাক পড়েছে সন্দেহ নেই তায় ! !

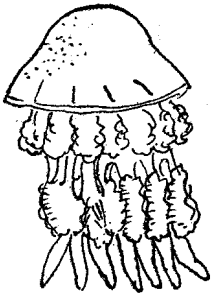

জেলিফিশ

জেলি-ফিশ ফিশ ! নাকি
থলথলে পোকা সে ?
চিক্‌চিক্ করে ওঠে
সূর্যের ফোকাসে।

ছাতার মতন দেহ
ভাসলেই বুঝবে—
ওটা আর কিছু নয়
জেলি-ফিশ ভাসছে ;
অন্য কোথাও তাকে
বৃথা কেন খুঁজবে ?
ভেসে ভেসে ধীরে ধীরে
এদিকেই আসছে।

মুখ দিয়ে ডিম পাড়ে,
হাত নেই, পা-ও—
জেলিফিশ মুখ দিয়ে
পাড়ে বাচ্চাও।

গভীর সমুদ্রে
পিতা-মাতা-পুত্রে
সকলেই বাস করে
সুখে নিশ্চিন্তে ;
এভাবে না বলে দিলে
আনাড়িয়া এক ঢিলে
পুরীতে নেমেই এতো
তাড়াতাড়ি চিনতে ?